ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

ইউনিট
১

ভূমিকাঃ

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণে ভারতবর্ষকে উপ-মহাদেশ বলা হয়। অষ্টম শতাব্দির শুরুর দিকে এ উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। তৎকালীন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য ও সামাজিক বৈষম্য ছিল বেশ প্রকট। ভারতে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু- এই তিন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল ভারতীয়রা। শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি-সভ্যতায় সে যুগে ভারতে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ও হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব পাদদেশে অবস্থিত ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মহামিলন ঘটেছে। ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রধান দেশ হওয়ায় আরব মুসলমানরা ভারতকে 'হিন্দুস্তান' নামে আখ্যা দিয়েছিল এবং এ নামটি এখনো প্রচলিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহঃ

পাঠ- ১ : মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

পাঠ- ২ : মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

পাঠ- ৩ : সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ- ৪ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অভিযান: তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ

পাঠ- ৫ : মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ-১.১ মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয়, প্রাদেশিক ও গ্রাম পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থার ধারণা পাবেন ও
- ভারতের তৎকালীন রাজনীতি ও স্বাধীন রাজ্যগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, উপারিক, বিষয় ও পঞ্চায়েত**

ভূমিকা: প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল ভারতবর্ষ। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে প্রধানত: তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। এগুলো হল বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম। প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন প্রধান এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত। রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল আইন প্রণয়ন, ক্ষমতার বন্টন, শাসন পরিচালনা এবং সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের চূড়ান্ত এখতিয়ার। রাজা হর্ষবর্ধন (মৃত্যু ৬৪৫খ্রি.) এর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক বিশৃংঙ্খলায় পতিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বিশৃংঙ্খলা ও নৈরাজ্যময় অবস্থা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুসলিম বিজয়ের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সময় ভারতবর্ষের কেন্দ্রিয় শাসন ও সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের ঐক্য ও সংহতির মূলে প্রবল আঘাত হানে।

ধর্মীয় ও প্রশাসনিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দুধর্ম দেশের প্রধান ধর্ম হিসেবে পরিণত হয়। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তারা সকলেই হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে ও শাসনকার্যে তাদের অধিকার ছিল একচেটিয়া। বৈশ্য ও শূদ্রগণ ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত এবং নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা ছিল অস্পৃশ্য। ব্রাহ্মণগণ ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে ধর্মীয় অসন্তোষ, অরাজকতা ও নৈরাজ্য চরম আকার ধারণ করে। সাম্প্রাদায়িক কলহ ও ধর্মীয় কোন্দল মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে বংশানুক্রমিকভাবে ভারতবর্ষের রাজা নিযুক্ত হতেন। রাজকুমারীগণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। রাজার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। তিনি আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ন্যায় বিচারের উৎস এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি রাজধর্মের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রীগণ রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। তবে রাজা তাঁদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। এ সময় সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক প্রধানকে বলা হত 'উপারিক'। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল প্রদেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা রাজার আদেশকে কার্যকরী করা এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা। প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলাকে বলা হত 'বিষয়'। জেলার শাসনকর্তা বিষয়পতি নামে অভিহিত হতেন। দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসন ব্যবস্থা মোড়ল বা পঞ্চায়েত কর্তৃক সম্পাদিত হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ। এ দেশের মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। অভিজাত ও উঁচু শ্রেণির অধিকাংশ লোক বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের বিবরণ অনুযায়ী তিনটি মূখ্য উৎস থেকে রাষ্ট্রের আয় ছিল: ক) ভূমি রাজস্ব, খ) সামন্ত প্রভু ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত কর, এবং গ) আবগারী ও বাণিজ্য শুল্ক। পরবর্তীতে এদেশে শিল্পের

ব্যাপক প্রসার ঘটে। গুজরাট ও বাংলা কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিভিন্ন পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হতে থাকে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল বলে এদেশে সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে পঞ্চম শতাব্দির শুরুতে ভারতবর্ষের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মগধের লোকেরা ধনী ও সমৃদ্ধশালী ছিল। পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দিতেও ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত ও নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। এদেশের অতুল ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী বণিকগণ যেমন এদেশে বারবার এসেছেন আবার বিদেশী আক্রমণকারীগণও এ দেশ বার বার লুণ্ঠন করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস চালিয়েছেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারটি বর্ণ স্তরে বিভক্ত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আর বৈশ্য ও শুদ্রদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। শুদ্রদের সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত। জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর ছিল। জনসাধারণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করতে পছন্দ করত। ব্রাহ্মণরা শিক্ষা, ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও কখনো কখনো যুদ্ধ বিগ্রহে নিয়োজিত থাকতো। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহ, বৈশ্যরা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শূদ্রগণ কৃষিকাজ ও সাধারণ কাজ কর্ম করত। বর্ণপ্রথার কারণে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ছিল। সমাজে বহু বিবাহ, সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। নারীরা অন্ত:পুরে জীবন যাপন করতেন। তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ছিল না। দাসপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। এতদ্বসত্ত্বেও অভিজাত শ্রেণির মেয়েরা উদার শিক্ষা লাভ করত। তারা শাসন ক্ষেত্রে ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করত। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রভূত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় ভারতীয়গণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সে যুগে ভারতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ভারতের স্বনামধন্য বল্লভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, বারানসী প্রভৃতি স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। মালব ও আজমীরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। জ্যোর্তিবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের চর্চা করা হত। সে যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা:

আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও কনৌজ

মৌর্য বংশের শাসনামল থেকেই আফগানিস্তান ছিল ভারতের একটি অংশ। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এটিকে হিন্দুশাহী রাজ্য বলে অভিহিত করেন। সপ্তম শতাব্দিতে কর্কট রাজবংশীয় দুর্লভ বর্ধনের অধীনে কাশ্মীর ছিল উত্তর ভারতের অপর একটি স্বাধীন রাজ্য। বিজেতা, বিদ্যোৎসাহী ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ছিলেন কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর। তিনি কনৌজ, কামরূপ, কলিঙ্গ ও গুজরাট জয় করেন বলে জানা যায়। কর্কট বংশের অপর একজন শাসক জয়পীড় গৌড় ও কনৌজের নৃপতিদের পরাজিত করেন। অষ্টম শতাব্দির প্রথম দিকে কনৌজ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হত। উত্তর-ভারতের অন্যতম পরাক্রমশালী রাজা যশোবর্মণ কনৌজের হৃত গৌরব ও আধিপত্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি গৌড় জয় করে এর রাজাকে হত্যা করেন এবং কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের সহায়তায় তিব্বত অভিযান করেন। তিনি চীনে দূত প্রেরণ করেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন। যশোবর্মণ, সিন্ধুরাজ দাহিরের সমসাময়িক ছিলেন। অত:পর অষ্টম শতকের প্রথম দিকে কনৌজে গুরজর-প্রতিহার রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু ও মালব-দিল্লি ও আজমীর

সপ্তম শতকে সিন্ধু ছিল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভূক্ত। পরবর্তীতে 'চাচ' নামক সিন্ধুর জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিন্ধুতে স্বাধীন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। চাচের পুত্র রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ইমাদউদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ সালে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রতিহার রাজপুতদের দ্বারা শাসিত মালব ছিল উত্তর-ভারতের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। উজ্জয়িনী ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। দ্বাদশ শতকে মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে দিল্লি ও আজমীরে শক্তিশালী চৌহান বংশীয় রাজপুত্রগণ রাজত্ব করত। এ বংশের শাসক বিশালদেব চৌহান প্রতিহর বংশের নিকট

থেকে দিল্লি দখল করেন। রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে তারা একটি বিশাল রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এ বংশের নৃপতি পৃথ্বীরাজের সাথে মুহাম্মদ ঘোরির পর পর দু'বার সংঘর্ষ হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১১৯২ খ্রি. পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলে চৌহান বংশের অবসান হয়।

গুজরাট, আসাম ও নেপাল

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে গুজরাট ছিল গুরজর প্রতীহার বংশের অধীনে। অত:পর তাদের আধিপত্য ক্ষুন্ন করে চালক্য ও ভাগেলা বংশ পর্যায়ক্রমে গুজরাট শাসন করে। নবম শতাব্দিতে চান্দেলা বংশ বুন্দেলখন্ডে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। শেষ রাজা গন্ড ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদের নিকট পরাজিত হন। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটি রাজ্য হল আসাম। এটি হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। এ সময় রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার স্বাধীন নৃপতি। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এই শাসকের মৃত্যুর পর বাংলায় মারাত্মক গোলযোগ ও বিশৃংঙ্খলা দেখা দেয়। নেপাল সপ্তম শতাব্দিতে উত্তর ভারতের অপর একটি স্বাধীন রাজ্য। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সাথে নেপালের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

মানচিত্র: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ

শিক্ষার্থীর কাজ	**উত্তর-পশ্চিম ভারতের এলাকাগুলো চিহ্নিত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুণ।**

সারসংক্ষেপ :

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বেশ উন্নত ছিল। তবে রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাও ছিল বেশ গোলযোগপূর্ণ। ভারতে এ সময় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ ঘটেছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাজা। তিনি শাসন ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রিয় শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও প্রদেশ থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রশাসনিক ইউনিট ছিল। তৎকালীন ভারতের সার্বিক অবস্থা মুসলিম বিজয় অভিযানের অনুকূলে ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে কাশ্মীরের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছিলেন?
ক) দুর্লভ বর্ধন খ) ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় গ) কণিস্কু ঘ) চানক্য

২. চৌহান বংশীয় কোন রাজার রাজত্বকালে তরাইনের যুদ্ধ দুটি সংঘটিত হয়?
ক) রাজাশূদ্র খ) রাজা দুর্লভ বর্ধন গ) রাজা দাহির ঘ) পৃথ্বীরাজ

৩. প্রাক-মুসলিম ভারতের কোন স্থানে উন্নত চিত্র ও স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন ছিল?
ক) গুজরাট খ) কলকাতা গ) অজন্তা-ইলোরা ঘ) দাক্ষিণাত্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রাজা মাইকেল সাম্রাজ্য পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে সমাজ পরিচালনায় রাজার কোন ভূমিকা ছিল না। শুধু তাই নয় ধর্মীয় কাজে ও সমাজ পরিচালনায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। সাধারণ ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা ছিল অস্পৃশ্য।

ক. প্রাক-মুসলিম ভারতের প্রাদেশিক প্রধানকে কী বলা হতো? ১
খ. তখনকার হিন্দু সমাজ কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে আপনার পঠিত ভারতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি তুলে ধরুন? ৪

পাঠ-১.২ মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সিন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুহম্মদ বিন-কাসিমের সৈন্য বাহিনীর সিন্ধু ও মুলতান বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন ও
- সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**দেবল বন্দর, 'বালিস্ত', রণকৌশল ও জহরব্রত**

ভূমিকা: আরব বণিকগণ ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করতো। আরবে ইসলামের আবির্ভাবের পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। আরব নাবিকদের অনেকেই এ উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে-সাদীও হয়। ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দি পর ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। উমাইয়া বংশের খলিফা প্রথম ওয়ালিদ তখন আরব জাহানের খলিফা। তাঁর অধীনে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জাজের নির্দেশে মুসলমানগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে। এরপর পর্যায়ক্রমে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু অভিযানের কারণসমূহ

তৎকালীন ভারতের সিন্ধু ও মুলতানের রাজা ছিলেন দাহির। আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন প্রথম ওয়ালিদ। আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ইরাক প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সিন্ধু ও মুলতানের সাথে আরব শাসনের সাধারণ সীমান্ত ছিল। নানা কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও রাজা দাহিরের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। এ কারণে হাজ্জাজ ভারতের সিন্ধু জয় করার জন্য তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুস্পুত্র ইমাদউদ্দিন মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে এক বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ: সিন্ধু বিজয়ের পরোক্ষ কারণসমূহের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ এবং প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে ছিল জলদস্যুদের দ্বারা আরব বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ

ভারত ধন-ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লাভ করা। রাজা দাহিরের রাজ্য ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত অভিন্ন হওয়ায় দুই রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই মতানৈক্য ও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো এবং সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই থাকত। হাজ্জাজ ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক। আইনের শাসন এড়িয়ে হাজ্জাজের অঞ্চল থেকে অনেক অপরাধী রাজা দাহিরের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সকল কারণে রাজনৈতিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই সময় সিন্ধুতে চলছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। দাহির ছিলেন অত্যাচারী শাসক। নিম্নশ্রেণির লোকেরা ছিল অত্যাচারিত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সুতরাং এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হাজ্জাজ সিন্ধু জয় করে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। ভারতে ইসলাম প্রচার করাও হাজ্জাজের একটি উদ্দেশ্য ছিল।

মুহম্মদ বিন-কাসিম

জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন

অষ্টম শতকের শুরুতে বেশ কয়েকজন আরব বণিক শ্রীলংকায় (তৎকালীন সিংহল) প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীলংকার রাজা মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে তাদের মৃতদেহ, পরিবার-পরিজন ও অর্থসামগ্রীসহ আটটি জাহাজে বোঝাই করে

প্রেরণ করেন। সাথে খলিফা এবং হাজ্জাজের জন্য কিছু উপহারও ছিল। সিন্ধুর বন্দর দেবলের (করাচির সন্নিকটে) কাছে এ সকল জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি করেন। কিন্তু দাহির বলে পাঠান যে, জলদস্যুদের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে হাজ্জাজের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। হাজ্জাজ এতে খুবই রেগে যান। তিনি দাহিরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে সিন্ধু অভিযানের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেন।

সিন্ধু অভিযানের ঘটনা

ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ সিন্ধু বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দু'টি অভিযান পাঠালেন। কিন্তু দু'টি অভিযানই ব্যর্থ হল। এতে হাজ্জাজ ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তৃতীয় অভিযান পাঠালেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন-কাসিমকে। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বয়স তখন মাত্র ১৭ (সতেরো) বছর। আগের দু'টি অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবার হাজ্জাজ ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেন। মুহম্মদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল প্রায় ৬০০০ পদাতিক, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৩০০০ তীরন্দাজ এবং ৩০০০ ভারবাহী পশু। তরুণ সেনানায়ক ছিলেন অসীম মনোবলের অধিকারী। নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলীই তাঁর ছিল। মুহম্মদ মাকরানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেন। মাকরানের শাসকের সাথে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। মাকরানের শাসক মুহম্মদকে আরও একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। রাজা দাহিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জাঠ ও মেওয়াট গণ মুসলমানদের পক্ষে যোগ দেয়। হাজ্জাজ জলপথেও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য একদল সৈন্য পাঠান। এছাড়া 'বলিস্ত' নামক একপ্রকার যন্ত্রও হাজ্জাজ পাঠিয়েছিলেন। বলিস্ত ছিল এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে ভারী পাথর দূরে নিক্ষেপ করে আঘাত করা সম্ভব ছিল।

মুহম্মদ বিন-কাসিম প্রথমেই দেবল বন্দর অবরোধ করেন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান সেনানায়ক। দেবলের প্রধান মন্দিরের চূড়ায় একটি লাল নিশান উড়ানো ছিল। তিনি বলিস্ত দিয়ে পাথর ছুড়ে নিশানটি ধ্বংস করে ফেলেন। এতে দেবলের সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল মন্দিরের চূড়ায় যতক্ষণ নিশান উড়বে ততক্ষণ বাইরের কোন শত্রু দেবল দখল করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ দেবল রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালান। তাঁরা অসীম সাহসে যুদ্ধ করলেও শেষে মুসলমানদের উন্নত রণকৌশলের কাছে পরাজিত হলো। মুসলমানদের দখলে এলো দেবল বন্দর। দেবল দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধু নদের তীর ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে নীরুন, সিওয়ান ও সিসাম শহরগুলো একের পর এক জয় করলেন। এগুলো দখল করতে তাঁকে তেমন কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু রাওয়ার দুর্গ দখলের ব্যাপারে মুহম্মদ বিন-কাসিমকে প্রচণ্ড বাঁধার মুখে পড়তে হয়। এখানে রাজা দাহির এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটান। মুহম্মদ বিন-কাসিম নৌকার সেতু তৈরি করে সিন্ধু নদ পার হন। অত:পর দাহিরের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাজা দাহির বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুতে সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সবাই পালিয়ে যায়। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে দাহিরের বিধবা পত্নী রাণীবাঈ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুর্গ রক্ষা করা যাবেনা ভেবে তিনি অন্ত:পুরের অন্যান্য রমনীদের নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেন। শত্রুর হাতে অপমানিত হওয়ার ভয়ে এভাবে মৃত্যুকে বেছে নেয়ার রীতি তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ছিল; একে হজরব্রত বলা হতো। রাওয়ার দুর্গ দখলের পর মুহম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন। এরপর সিন্ধুর রাজধানী আলোর দুর্গের পতন ঘটে। আলোর জয় করে তিনি সিন্ধু অঞ্চলে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। এরপর মুহম্মদ বিন-কাসিম আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে মুলতান জয় করেন। মুলতানের পথে তিনি রাভী নদীর তীরে অবস্থিত উচ্ দখল করেন। মুলতান দখল করতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মুলতান রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে স্থানীয় যোদ্ধারা প্রায় দু'মাস মুলতান দুর্গ রক্ষায় সক্ষম হয়। অবশেষে তাদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে মুহম্মদ বিন-কাসিম মুলতান দখল করতে সক্ষম হন। মুলতান দখলের মধ্য দিয়ে রাজা দাহিরের রাজ্যের পুরোটাই মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ৭১২ থেকে ৭১৫ পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সিন্ধু-মুলতানে তিনি মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যু হয়। পরবর্তী খলিফা সোলায়মান আল ওয়ালিদের আস্থাভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রতি বিরূপ আচরণ শুরু করেন এবং তিনি মুহম্মদ বিন-কাসিমকে দামেস্কে যেতে নির্দেশ পাঠান। সেখানে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। মুহম্মদ বিন-কাসিমের অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর বিজয় অভিযান সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষত এ কারণেই মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি একটি নিষ্ফল বিজয়।" কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর এই মন্তব্যকে সমর্থন করলেও কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।

রাজনৈতিক ফলাফল

একথা সত্য যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলে এ বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। আরবরা সিন্ধু অঞ্চলে এক উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং কেউ কেউ স্থানীয় রমণীও বিয়ে করেন। এভাবে ভারতে স্থায়ী মুসলমান বসতি গড়ে ওঠে। তারা রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে। আরব বংশধর ও হিন্দুগণ দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় সুলতান মাহমুদকে বারবার ভারত অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিল। সুলতান মাহমুদের পর মুহম্মদ ঘোরি ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তবে মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয়কে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিন্ধু বিজয়ের সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল লক্ষ্যণীয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার কারণে তারা ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জাঠ ও মেওয়াটগণ মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই বিজয়ের ফলে আরব সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় এর ফলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূর প্রসারী হয়। ফলে দু'পক্ষই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে আরবগণ গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমীয় এবং পারসিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। তারা এ সকল সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধন করে। মুসলমানগণ যখন ভারতে আসে তখন তারা ছিল এই সমন্বিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী। ভারতীয়রা দর্শন, সাহিত্য, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলে ভাবের আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণ ঘটে। আব্বাসীয় যুগের খলিফাগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে 'সিন্দহিন্দ' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। খলিফা মনসুরের আমন্ত্রণে কয়েকজন ভারতীয় পন্ডিত বাগদাদ যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে যান জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত 'সিদ্ধান্ত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি। আরবীয় পন্ডিতগণ এটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় 'সিন্দহিন্দ'। ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবগণ গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত 'চরক' ও 'সুশ্রুত' আরবিতে অনূদিত হয়। 'পঞ্চতন্ত্রের' হিতোপদেশ আরবিতে অনূদিত হয়ে আরব ভূখন্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী-ব্যাখ্যা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় তাঁর অনুমতি নিয়ে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহম্মদ বিন-কাসিমের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সিন্ধু বিজয় করেন। এছাড়া দেবল, নীরুন, সিওয়ান, সিসাম, সিন্ধুর রাজধানী আলোর দূর্গ এবং মুলতান মুসলমানদের দখলে আসে। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সিন্ধু বিজয় পরবর্তী মুসলিম অভিযানকে সফল করে তুলেছিল। ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা ইসলামের সংস্পর্শে এসে বহুলাংশে হ্রাস পায়। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামি ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যে উভয় সভ্যতা লাভবান হয়। মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া ভারতে সুফীবাদেরও উন্মেষ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন–
ক. আবদুল মালিক খ. প্রথম ওয়ালিদ গ. হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ ঘ. হারুন-অর-রশীদ

২। মুসলমানদের বিজয়ের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন–
ক. রাজা দাহির খ. রাজা হর্ষবর্ধন গ. রাজা পরশুরাম ঘ. রাজা লক্ষ্মণসেন

৩। জলদস্যুগণ যে বন্দরের কাছে ৮টি আরব জাহাজ লুঠ করে তার নাম–
ক. বোম্বাই খ. মাদ্রাজ গ. দেবল ঘ. সুরাট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আরব নাবিকদের অনেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে-সাদী হয়। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় একশ' বছর পর ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামি ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যে উভয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়।

ক. কোন মুসলিম বীর প্রথম ভারত আক্রমণ করেন? ১
খ. মুহম্মদ বিন-কাসিম এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় দেশের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে বিবরণ দিন। ৩
ঘ. "ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান"-ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-১.৩ সুলতান মাহমুদঃ সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের বিভিন্ন কারণসূমহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও অভিযান প্রতিহতের বিবরণ দিতে পারবেন ও
- সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পর্যায় ক্রমিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**গজনী, ধনরত্ন, মুলতান ও রাজন্যবর্গ ও সোমনাথ মন্দির**

ভূমিকা: সুলতান মাহমুদের অভিযানের কারণ

সুলতান মাহমুদ ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভুত। মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু অভিযানের প্রায় তিনশ বছর পর গজনির সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেন। গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলপ্তগীন। আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা গজনীর আমির সবুক্তগীনের পুত্র ছিলেন সুলতান মাহমুদ। এ রাজবংশটি ইসলামের ইতিহাসে 'গজনি রাজবংশ' নামে পরিচিত। সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইল সিংহাসনে বসেন। ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আমির-এর পরিবর্তে সুলতান উপাধি ধারণ করেন। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সতেরো বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযানের কারণগুলোকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয়।

রাজনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীনের সময় থেকে গজনির সাথে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের বিরোধ চলছিল। পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী রাজ্যের রাজা জয়পাল সবুক্তগীনের শত্রু হওয়ায় সুলতান মাহমুদ জয়পালের সাথে শত্রুতা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। ভারতের অনেক রাজা জয়পালের সাথে মাহমুদ বিরোধী জোটে যোগদান করেন। সুতরাং মাহমুদকে তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করতে হয়। আবার ভারতের কোন কোন রাজা মাহমুদের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। এতে তাঁদের প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রতি বৈরী আচরণ শুরু করেন। মিত্রবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও মাহমুদকে ভারতে অভিযান করতে হয়। পরাজিত রাজারা মাহমুদের সাথে সন্ধি করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেয়ে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন। বিদ্রোহী রাজাদের সন্ধির শর্ত পালনে বাধ্য করার জন্যও মাহমুদকে অভিযান করতে হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদ রাজধানী গজনিকে তিলোত্তোমা নগরীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ছিল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। তিনি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এসবের জন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। গজনীর রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাঁর চাহিদার যোগান দিতে পারছিল না। তাই তিনি বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। তখন ভারত ছিল সম্পদশালী দেশ। এখানকার বিভিন্ন রাজ্যের কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ অকাতরে মন্দিরগুলোতে দান করতো। মন্দিরকে নিরাপদ বিবেচনা করে অনেক সময় রাজারাও তাতে ধনরত্ন সংরক্ষণ করতেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সুলতান মাহমুদের নজর ভারতের উপর পড়ে। এজন্য তিনি প্রায় প্রতি বছর ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ভারত থেকে প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। প্রফেসর হাবিব, প্রফেসর নাজিম ও হেইগ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলে মাহমুদকে লুণ্ঠনকারী বা অর্থলোলুপ তস্কর বলা যাবে না। কারণ ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য তিনি সে অর্থ ব্যবহার করেন নি।

সামরিক উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এ সকল অঞ্চল ছিল সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ সমরবিদ হিসেবে তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিল সুশৃংঙ্খল ও সমরনিপুণ। তিনি বুঝতে পারেন এ সকল অঞ্চল জয় করতে তাঁকে খুব একটা বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করে তাঁর সামরিক উদ্দেশ্য হাসিল করেছিলেন।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পশ্চাতে কোন কোন ঐতিহাসিক ধর্মীয় উদ্দেশ্যও কার্যকর ছিল বলে মনে করেন। তাঁদের মতে তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন মাহমুদের যুগে শাসকগণ ইসলাম প্রচার করা তেমন কর্তব্য বলে মনে করতেন না। তিনি ভারত অভিযানে এসে কোন বিধর্মীকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি। এছাড়া মাহমুদ হিন্দু মন্দির দখল করেছেন ধর্ম বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং অর্থ পাওয়ার আশায়। এ সকল মন্দির ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদে পূর্ণ। সর্বোপরি তাঁর সেনাবাহিনীতে হিন্দু সৈন্যের উপস্থিতি তার ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যকে অনুমোদন করে না।

সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযান

সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাত্র ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে তিনি খাইবার গিরিপথের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। পিতা সবুক্তগীনের সময় থেকেই জয়পালের সাথে তাদের শত্রুতা চলে আসছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। তিনি কয়েকজন পুত্র-পৌত্রসহ সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দী এবং কয়েকটি শর্তে তিনি মুক্তি পান। নিজ পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্যের ভার ছেড়ে দেন তিনি। অত:পর তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জয়পালের পৌত্র সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় 'নওশাহ'। ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভীরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বিজয় রায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিজয় রায় পলায়ন করেন। মুসলমান সৈন্যগণ তাঁর পিছু ধাওয়া করে। পলায়ন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন। ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন। মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন আবুল ফতেহ দাউদ। দাউদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মাহমুদ জয়পালের পুত্র নওশাহকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান গজনীতে ফিরে যাওয়া মাত্র নওশাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। সুলতান তাঁকে দমন করার জন্য আবার অভিযান পাঠান। এটি ছিল ভারতে তাঁর পঞ্চম অভিযান। নওশাহ পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ ভারতে তাঁর ষষ্ঠ অভিযান পরিচালনা করলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আনন্দপাল পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলোর রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লি ও আজমীরের রাজাগণ এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া দেন। হিন্দু রমণীগণ তাদের গায়ের গহনা ও অন্যরা সৈন্য ও অর্থ দিয়ে আনন্দপালকে সাহায্য করেন। আনন্দপাল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাহমুদের মুখোমুখি হন। ওয়াইহিন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আনন্দপালের সম্মিলিত বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ আনন্দপালের হাতী ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। এতে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হয়ে পাঞ্জাব থেকে প্রচুর ধন-রত্ন গজনীতে নিয়ে যান। পাঞ্জাবকে তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

মাহমুদ ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিলোচনপালের রাজধানী নন্দনা আক্রমণ করেন। এটি ছিল তাঁর নবম অভিযান। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরে পলায়ন করেন। কাশ্মীরের রাজা তুঙ্গ তাঁকে আশ্রয় দেন। মাহমুদের সাথে তাঁদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও মাহমুদ জয়ী হন। সুলতান গজনীতে ফিরে গেলে ত্রিলোচনপাল পাঞ্জাবে ফিরে আসেন। তিনি শিবলী পাহাড়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। বুন্দেলখন্ডের রাজা বিদ্যাধরের সাথে তিনি মৈত্রী চুক্তি করেন। মাহমুদ তাঁকে এই চুক্তি ভঙ্গ করতে বলেন। কিন্তু ত্রিলোচন এতে রাজী হন নি। মাহমুদ তাই তার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। এবার মাহমুদ পাঞ্জাব দখল করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিজের একজন আমিরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুলতান মাহমুদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয় কনৌজের বিরুদ্ধে। এটি ছিল তাঁর ১২তম অভিযান। কনৌজ ভারতের কেন্দ্রিয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। রাজ্যপাল ছিলেন সে-সময় কনৌজের রাজা। মাহমুদ ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে

একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে গজনী ত্যাগ করেন এবং পথে তিনি বারণ জয় করেন। বারণের রাজা তাঁর অনুচরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অত:পর সুলতান কনৌজের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছালে রাজ্যপাল সামান্য বাঁধা দানের পর আত্মসমর্পণ করেন। রাজ্যপাল সুলতানের নিকট নতি স্বীকার করায় ভারতের অন্যান্য রাজারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। কালিঞ্জরের রাজা গোন্ড তাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁরা একজোট হয়ে কনৌজ আক্রমণ ও রাজ্যপালকে তাঁরা হত্যা করেন। রাজ্যপালের পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয়। এতে মাহমুদ খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি গোন্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারত অভিযান করেন। গোন্ড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এটি ছিল তাঁর ১৩তম অভিযান। মাহমুদের ১৪ তম ও ১৫ তম অভিযান পরিচালিত হয় যথাক্রমে গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে। উভয় অভিযানে তিনি সফল হন। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর থেকে তিনি প্রচুর ধন-রত্ন প্রাপ্ত হন। উভয় রাজ্যের রাজা বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য হয়। মাহমুদের অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ষোড়শ অভিযান। কাথিওয়ারের বর্তমান গুজরাট এর সোমনাথ মন্দিরের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই মন্দিরে বিপুল পরিমাণ ধন-রত্ন সঞ্চিত ছিল। ধনী ব্যক্তিগণ এবং রাজণ্যবর্গ এই মন্দিরে অর্থ হিসেবে সোনা-রূপা দান করতেন। তাছাড়া অনেকেই মন্দিরকে নিরাপদ স্থান মনে করে সেখানে তাদের ব্যক্তিগত ধন-রত্নও গচ্ছিত রাখতেন। হিন্দুগণ সোমনাথ মন্দিরকে অজেয় মনে করতো। মাহমুদ সোমনাথ জয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে গজনী থেকে বের হন। মুলতান ও রাজস্থান হয়ে তিনি সোমনাথ মন্দিরের দ্বারে এসে পৌঁছেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা সোমনাথ মন্দির রক্ষার জন্য বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু ১০২৬ খ্রি. মাহমুদ তাদের সকল বাঁধা ছিন্ন করেন। এই মন্দির থেকে তিনি বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই সম্পদের মধ্যে ছিল দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা, প্রচুর অলঙ্কার ও মণি-মানিক্য। মাহমুদের সোমনাথ বিজয় ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম দুঃসাহসিক অভিযান। ভারতে সুলতান মাহমুদের শেষ অভিযান পরিচালিত হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। মাহমুদ যখন সোমনাথ অভিযান শেষে গজনি ফিরছিলেন তখন জাঠগণ চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে উত্যক্ত করে। তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য মাহমুদ ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই শেষ অভিযান পরিচালনা করে জাঠদের পরাজিত করেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান নিষ্ফল ছিল না। মাহমুদের এই অভিযানের ফলাফলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই তিন ভাগে পাওয়া যায়।

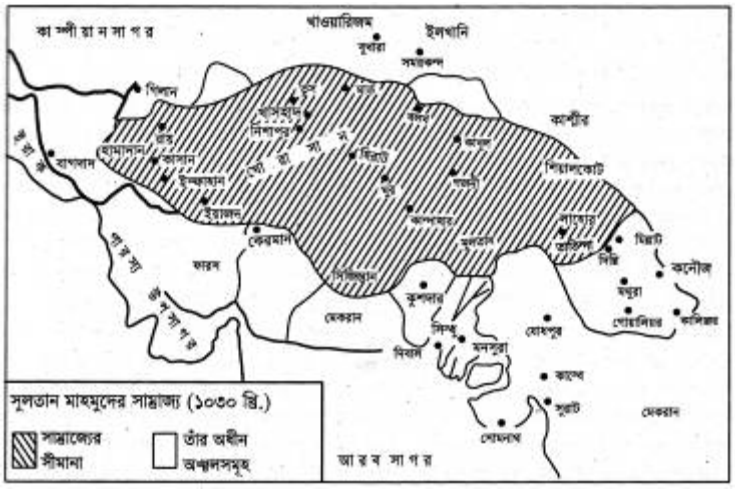

মানচিত্র: সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রভাব সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনুভূত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই অভিযানের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুলতান মাহমুদ অভিযান করেছেন, জয়লাভ করেছেন এবং ধন-সম্পদ নিয়ে নিজের রাজ্য গজনিতে ফিরে গিয়েছেন। শুধু পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং কোন স্থায়ী সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেন নি। কয়েকজন রাজা অবশ্য তাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই সকল রাজা কর প্রদান বন্ধ করেন। পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান সফল হয় নি। তবে এ কথাও সত্য যে, সুলতান মাহমুদের বিজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। সুলতান মাহমুদের বার বার আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নি। সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় ভারতীয় সামরিক শক্তি ও রণকৌশল মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও রণকৌশলের তুলনায় যে

কত দুর্বল তা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। মাহমুদ ভারতের সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, দুর্গ ও মন্দির আক্রমণ করেন ধন-রত্ন লাভ করার জন্য। এই জন্য এ সকল লক্ষ্যস্থল থেকে তিনি প্রচুর সম্পদ নিজ রাজধানী গজনিতে নিয়ে যান। এর ফলে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে গজনি অর্জন করে আর্থিক সমৃদ্ধি। ভারতের আর্থিক দুর্বলতা তার সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল ছিল লক্ষ্যনীয়। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও লক্ষ্যনীয়। সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ মন্তব্য করেন, "তিনিই প্রথম ভারতের মধ্যস্থলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন"। সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীর সাথে অনেক সুফি-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে আসেন। সুফি-দরবেশগণ ভারতে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে বহু ভারতীয় ইসলাম গ্রহণ করে। পন্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি চিন্তা-চেতনার সমন্বয় সাধন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত পন্ডিত আল-বিরুনী দশ বছর ভারতে অবস্থান করেন। তিনি ভারতীয় পন্ডিতদের নিকট ভারতের দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এর ফল স্বরূপ তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব-উল-হিন্দ' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। মাহমুদের অভিযানের ফলে ইসলামি সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটে।

সুলতান মাহমুদ

সোমনাথ মন্দির

সুলতান মাহমুদঃ চরিত্র ও কৃতিত্ব

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ও বিজেতা হিসেবে সুলতান মাহমুদের অবস্থান ইতিহাসের পাতায় এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে। সুলতান মাহমুদ অনেকবার বিজয়ী হয়ে জীবনের শেষ বেলায় অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৬০ বছর বয়সে গজনিতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি প্রায় ৩২ বছর রাজত্ব করেন। সুলতান মাহমুদকে তাঁর যুগের প্রতিভাবান শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ ছিলেন একজন সুনিপুন সৈনিক। তাঁর দেহে ছিল যেমন শক্তি, তেমনি মনেও ছিল অফুরন্ত সাহস।

সুলতান মাহমুদ সকল অভিযানেই বিজয়ী হয়েছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে 'বড় মাপের দিগ্বিজয়ী বীর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈশ্বর টোপ্পয়ার মতে, সুলতান মাহমুদ ছিলেন 'গজনির নেপোলিয়ন'। সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব, তীক্ষ্ণতা এবং সামরিক সংগঠক হিসেবে সুলতান মাহমুদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আরব,আফগান, ইরান, তুরান, হিন্দু ও তুর্কিদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীর ক্ষিপ্রতা, সাহসিকতা ও অপরাজেয়তা তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচায়ক। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, একটি পার্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে শুধু শক্তির বলে বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। আরব-তুর্কি শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি হিরাত, কাবুল ও গজনির সীমা অতিক্রম করে সমগ্র আফগানিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক গিবনের মতে, সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ভারতবর্ষের আবহাওয়ার কথা ভেবে তিনি অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে অভিযান আরম্ভ করতেন এবং শীতকালে গিরিপথ, মরুভূমি এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল অতিক্রম করে তিন মাসের মধ্যে গাঙ্গেয় অঞ্চলে পৌঁছে যেতেন। আর শত্রু নিধন ও ধন-সম্পদ লাভ করে গ্রীষ্মের পূর্বেই গজনিতে প্রত্যাবর্তন করতেন। সুলতান মাহমুদ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা আল বিরুনী

ছিলেন, সুলতান মাহমুদের দরবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে গ্রন্থটি আল বিরুনীকে ইতিহাসে বিখ্যাত করে রেখেছে তা হলো 'কিতাব-উল-হিন্দ'। ঈশ্বরী প্রসাদ সুলতান মাহমুদের যুগকে কবিতার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। ঐ যুগের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবুল কাশেম ফেরদৌসী। প্রাচ্যের হোমার নামে খ্যাত এ কবি সুলতান মাহমুদের অনুরোধে জগদ্বিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকাব্য রচনা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ:

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতে অনুভূত হয়। পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সুলতান মাহমুদের এ বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। সুলতান মাহমুদের বার বার আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গ সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নি। ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁকে 'বড় মাপের দ্বিগ্বিজয়ী বীর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুলতান মাহমুদ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল বিরুনীর বিখ্যাত 'কিতাব-উল-হিন্দ' ও কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর জগদ্বিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকাব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাহমুদ কোন দেশের সুলতান ছিলেন–
ক. আফগানিস্তান খ. গজনী গ. ঘোর ঘ. কাবুল

২। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমুদকে কি উপাধিতে ভূষিত করেন?
ক. সুলতান খ. সুলতান-উস-সালাতিন গ. ইয়ামিন-উদ-দৌলা ঘ. সুলতান-উল-আজম

৩। সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান করেন–
ক. ১২ বার খ. ১৪ বার গ. ১৬ বার ঘ. ১৭ বার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ফারহানা ইসলাম তার দাদার নিকট ইসলামের ইতিহাসের একজন সুলতানের ১৭ বার ভারত আক্রমণের গল্প শুনছিল। পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর ভারত অভিযান ব্যর্থ হয়। তবে এ কথাও সত্য যে, বিজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

ক. গজনবীর অবস্থান কোথায়? ১
খ. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানের সাথে পাঠ্য বইয়ের ভারত আক্রমণের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কোন স্থান থেকে সুলতান সবচেয়ে বেশী সম্পদ আহরণ করেছিলেন লিখুন । ৪

পাঠ-১.৪ মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির উত্তর ভারত অভিযান: তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুহম্মদ ঘোরি কর্তৃক বিজিত এলাকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- ঘোরির ভারত অভিযানের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মুলতান, পৃথ্বীরাজ, কনৌজ, বারাণসী ও আজমির**

ভূমিকা: গজনীর শাসনকর্তা হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরি ভারতে অনেকগুলো অভিযান প্রেরণ করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরি কারমাতি শিয়াদের পরাজিত করে মুলতান দখল করেন। তিনি অন্য শিয়া সম্প্রদায় সুমরাদের কাছ থেকে সিন্ধু নিজ হস্তগত করেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার আক্রমণ করেন। কিন্তু গুজরাট রাজের হাতে তিনি পরাজিত হন। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন। এরপর কয়েক বছর তিনি পাঞ্জাবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। অবশেষে গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব ঘোর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ। ঘোর নামক স্থানে জন্মে ছিলেন বলে ভারতের ইতিহাসে তিনি মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরি নামে পরিচিত। তিনি দিল্লি ও এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন। ফলে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রি.)

মুহম্মদ ঘোরি পাঞ্জাব দখল করলে ভারতের হিন্দু রাজাগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ১১৮৯ খ্রি. ভাতিন্দা দখল করে মুহম্মদ ঘোরি চৌহান রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে দিল্লি ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান একটি শক্তি-সংঘ গঠন করেন। পৃথ্বীরাজের আহ্বানে অনেক রাজা সাড়া দেন। তবে কনৌজের রাজা জয়চাঁদের সাথে পৃথ্বীরাজের সুসম্পর্ক ছিল না। পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ পাননি। তিনি ছদ্মবেশে এসে সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন। মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইন প্রান্তরে মিলিত পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে মুহম্মদ ঘোরির প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির বাহিনী পরাজিত হলে তিনি নিজে আহত হন ও পলায়ন করেন। এটি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত ছিল।

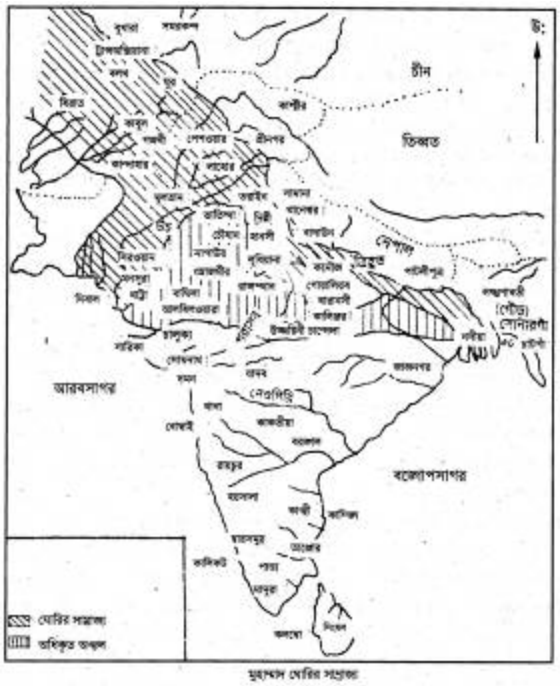

মানচিত্র: মুহম্মদ ঘোরির বিজিত অঞ্চলসমূহ

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২ খ্রি.)

মুহম্মদ ঘোরি দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও পর বৎসর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবার ভারত আক্রমণ করেন। এবারও পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সাথে তরাইনের প্রান্তরে তাঁর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেই বহু সৈন্য নিহত হয়। এবার পৃথ্বীরাজের বাহিনী পরাজিত হলে পৃথ্বীরাজ পলায়ন করেন। কিন্তু সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সিরসুতী নামক স্থানে তিনি ধরা পড়লে তাঁকে হত্যা করা হয়। আজমীর

পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে আসে। উন্নত রণকৌশল এবং সৈন্য পরিচালনার দক্ষতায় ঘোরির সৈন্যবাহিনী রাজপুতদের নির্মমভাবে পরাজিত করে। অত:পর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুহম্মদ ঘোরি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কুতুবউদ্দিন আইবক মুসলিম বিজয়কে আরও সম্প্রসারিত করে হান্সী, মীরাট, দিল্লি ও কুইলী দখল করেন। জয়চাঁদের সাথে মোকাবেলার জন্য মুহম্মদ ঘোরি ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভারতে আসেন। কুতুবউদ্দিন তাঁর সাথে যোগ দেন। কনৌজ মুহম্মদ ঘোরির দখলে আসে। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বারাণসী অধিকার করে গজনী ফিরে যান। তাঁর প্রতিনিধি কুতবউদ্দিন গোয়ালিয়র জয় করেন। এরপর কুতুবউদ্দিন ভীমকে পরাজিত করে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার দখল করেন। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কালিঞ্জরও কুতুবউদ্দিনের অধিকারে আসে। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ঝাড়খণ্ড এর মধ্য দিয়ে বখতিয়ার খলজী সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া ও বঙ্গ পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়। তখন মুহম্মদ ঘোরি ঘোরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম উপাধি গ্রহণ করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরির মুদ্রা

মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযান পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযানগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফলের তুলনায় বেশী ছিল। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধু সিন্ধু ও মুলতানে সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত অভিযান করলেও এর তাৎক্ষনিক কোন রাজনৈতিক ফলাফল ছিল না। তাঁর অভিযানগুলো ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযান এদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করার পর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তিনি আজমীর পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভি.এ. স্মিথ বলেন, "এই যুদ্ধ হিন্দুস্থানের উপর মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যের নিশ্চয়তা দান করেছিল।" বিজিত এলাকা শাসন করার জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কুতুবউদ্দিনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। বস্তুত কুতুবউদ্দিনের বিজয় ছিল তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির বিজয়েরই যৌক্তিক পরিণতি। কনৌজ ও বারাণসী জয় করে মুহম্মদ ঘোরি ভারতে মুসলিম বিজয়কে সুসংহত করেন। এরপর বখতিয়ার খলজির বিহার ও বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজন পড়লো নতুন প্রশাসনের। মুহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ভারতীয় প্রশাসনিক রীতির সাথে ইসলামি রীতির মিলন ঘটান। ফলে উদ্ভব ঘটে এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার। তিনি প্রশাসন স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের হাতে ন্যস্ত করেন। বিচার কাজ সম্পন্ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুসলমান কাজী ও ফৌজদার নিযুক্ত হন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরির অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন এবং ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথা মুসলিম শাসনে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয়। ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে। এক নতুন ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। এভাবেই মুহম্মদ ঘোরির বিজয় অভিযান ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক বিজিত রাজ্যগুলোর একটি মানচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপঃ

ঘোর রাজ্যের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব জয়ের জন্য যুদ্ধ করেন ভারতের হিন্দু রাজশক্তিগুলোর সাথে। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হলেও তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। পলায়নকালে পৃথ্বীরাজ নিহত হলে আজমীর তাঁর দখলে আসে। তিনি কুতুবউদ্দিনকে ভারতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দিন দিল্লিসহ ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করেন। কনৌজের জয়চাঁদকে পরাজিত করে মুহম্মদ ঘোরি কনৌজ ও বারাণসী দখল করেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইয়ের মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘোরি ঘোরের সুলতান হন। এই অভিযানের ফলে এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তরাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরির নিকট পরাজিত হয়।
ক. মুহম্মদ বিন-কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ গ. পৃথ্বীরাজের বাহিনী ঘ. কুতুবউদ্দীন আইবেক

২। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় –
ক. ১০৯২ খ্রি. খ. ১১৯০ খ্রি. গ. ১০৯০ খ্রি. ঘ. ১১৯২ খ্রি.

৩। মুইজ উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন?
ক. ১১০৪ খ্রি. খ. ১১০৬ খ্রি. গ. ১১০৫ খ্রি. ঘ. ১১০৭ খ্রি.

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রায়হান বিশ্বাস মাগুরা জেলার একজন বিখ্যাত কুস্তিগির ছিলেন। প্রথম বছর কুস্তি খেলতে শ্রীপুর উপজেলা থেকে মাগুরা জেলায় আসেন। এ বছর তিনি কুস্তি খেলার প্রথম ধাপেই বাদ পড়ে যান। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। এরপরের বছর তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এলেন এবং জেলার সেরা কুস্তি খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন।

ক. ঘোর রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? ১
খ. মুহম্মদ ঘোরি কোন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন লিখুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রায়হান বিশ্বাসের ন্যায় মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানে সফলতার ব্যাখ্যা দিন। ৩
ঘ পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযান অপেক্ষা মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানের ফলাফল ব্যাপক ছিল-বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-১.৫ মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুহম্মদ ঘোরি কর্তৃক বিজিত এলাকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- মুইজউদ্দিন মুহম্মদ ঘোরির কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মুলতান, আনহিলওয়ার, কনৌজ ও বারাণসী**

ভূমিকা: মুহম্মদ ঘোরি ভারতে অনেকগুলো অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি দিল্লি ও এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন এবং ভারতে সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অর্জন করেন। মুহাম্মদ ঘুরি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে একজন শিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হন। তাঁর নিকট শত্রু-মিত্র সকলেই ন্যায় বিচার পেতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন। মানুষ হিসেবে তিনি আকর্ষনীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয়, ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও দানশীলতা ইত্যাদি। সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল তার চরিত্রের উজ্জ্বল দিক। জেষ্ঠ্য ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিনের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ইতিহাসে তাঁকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছে। এজন্যই হয়তো ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিস্তা তাকে আল্লাহভীরু, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দয়ালু ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

মুহম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব

মুহম্মদ ঘোরি ছিলেন একজন বিজেতা। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি সুচতুর ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। কোন ব্যর্থতা কোনদিন তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর মনোবল ও সংগঠনী শক্তি ছিল অসাধারণ। অন্য ধর্মের লোকের প্রতিও তিনি সদয় আচরণ করতেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তিনি যে আনুগত্য দেখান ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তবিরল। তিনি দয়ালু ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর স্থান ইতিহাসে অম্লান। মুহম্মদ ঘোরির অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয় এবং ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে।

রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা:

মুহম্মদ ঘোরি ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। লক্ষ্য ছিল তাঁর ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার। ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও কোনো পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে তিনি লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্থির ছিলেন। এজন্য তিনি বাঙলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ইতিহাসে পরিচিতি হন নি বরং একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যা তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

সমরনেতা ও সংগঠকঃ

মুহম্মদ ঘোরি একজন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসবিদ এ বি এম হবীবুল্লাহর মতে, "শীর দরিয়া থেকে যমুনা পর্যন্ত সামরিক অভিযান তাঁর সমর কুশলতা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রমাণ করে। মুহম্মদ ঘোরি অসংখ্য তুর্কী ক্রীতদাসদের যুদ্ধকৌশল ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান এবং প্রতিভা অন্বেষণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত নেতা ও সংগঠক। তিনি সে সময়ের খ্যাতিমান সমরবিদ কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইয়ালদুজ ও তুঘ্রিল বেগের ন্যায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তাঁর বিজয়াভিযান ও রাজ্য গঠনে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ ঘোরি তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিনিধি ও শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন বলেই ভারতে তথাকথিত দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী সাম্রাজ্য আর রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল।

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকঃ

মুহম্মদ ঘোরির প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতে ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এ বি এম হবীবুল্লাহ বলেন, "সমরক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততার কারণে তিনি (মুহম্মদ ঘোরি) হয়তো শিল্প-সংস্কৃতির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি জ্ঞানচর্চার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।" তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিল খ্যাতনামা দার্শনিক ফখরুদ্দিন আল রাজী, কবি নিজামী, সাহিত্যিক মুবারক শাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ। কুতুব উদ্দিন আইবেক আজমিরে 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ ও দিল্লিতে 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এতে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সূচনা করেন।

মুহম্মদ ঘোরি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি ভারতের ধনসম্পদ হস্তগত করেই থেমে যান নি বরং সেখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ দিক থেকে মুহম্মদ ঘোরি সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা অধিকতর কুশলী ছিলেন। তিনি সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক দূর্বলতা ও বিশৃংঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হন। ভারতীয় ইতিহাসের খ্যাতিমান শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শিল্প, সংস্কৃতিচর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা মুহম্মদ ঘোরি অনেক বেশী সফল ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ

শিক্ষার্থীর কাজ	**মুহাম্মদ ঘোরির চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন**

সারসংক্ষেপ :

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘোরি সুলতান হন। তাঁর অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বিজিত অঞ্চলে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ গড়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয় এবং ফলে ভারতীয় ও মুসলিম স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে। প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত মুসলিম প্রাধান্যের আওতায় আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে ভারতে–

i. বাণিজ্যিক পথ সুগম হয়
ii. রাজপুতদের প্রাধান্য খর্ব হয়
iii. মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন –

ক. সেনাপতি খ. কাঠুরিয়া গ. শ্রমিক ঘ. দিনমজুর

৩। 'শাহনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. আল বিরুনী খ. আবুল কাশেম ফেরদৌসি গ. আবুল ফজল ঘ. আবুল হাসান ফিদা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান সাহেব ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান। ভারতে অবস্থিত কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত 'কুতুব মিনার' পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনিও দেশীয় স্থাপত্য ও শিল্প কলা নির্মানে আর্থিক সহায়তা দান করবেন। এত করে স্থানীয় শিল্পকলার বিকাশে সহায়তা করা হল। এই শিল্পকলা একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে কাজ করে বহুদিন পর্যন্ত।

ক. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত? ১
খ. মুহাম্মদ ঘোরি কোন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন লিখুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্থাপত্য নিদর্শনের বর্ণনা দিন। ৩
ঘ পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযান অপেক্ষা মুহম্মদ ঘোরির ভারত অভিযানের ফলাফল ব্যাপক ছিল-ব্যাখ্যা লিখুন। ৪

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১. খ ২. ঘ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১. গ ২. ক ৩. খ